সম্পাদকীয়

জনগণ সরকারকে স্পর্শ করতে পারবে না

আদালত যাতে কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে স্পর্শ করতে না পারেন তার ব্যবস্থা করে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলের আদালত অবমাননা আইন বাতিল করে এ সম্পর্কিত নতুন আইন তৈরির আড়ালে অশুভ এ আয়োজন চলছে। পুরনো আইন সংশোধনের কৃতিত্ব অর্জনের ছদ্মাবরণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ব্যবহার করছে সরকারের আমলা প্রশাসন।

এ লক্ষ্যে তৈরি করা খসড়া অনুযায়ী আইনটি জারি হলে ভবিষ্যতে আদালতের রায়, ডিক্রি, আদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ পালনে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কোনো তাগিদ থাকবে না। তাদের অন্যায়, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচার থেকে রক্ষা পেতে কিংবা মান-মর্যাদা ও সম্পদ এমনকি জীবনের নিরাপত্তার জন্য কেউ আদালতের শরণাপন্ন হলে তাকে প্রতিকার দেওয়ার মতো ক্ষমতা হারাবেন দেশের আদালতগুলো। অথচ চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা, হত্যা ও সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব ছাড়া দেশের নিম্ন আদালতের প্রায় ৪৮ শতাংশ এবং উচ্চ আদালতে ৮৫ ভাগ মামলাই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে দায়ের হয়। এসব মামলার রায়ে দেওয়া আদালতের আদেশ-নির্দেশ পালন না করলে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার কার্যত্রক্রম গ্রহণ করা হয়। নতুন আইনটি প্রণয়নের পর এ পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এতে সব পর্যায়ের আদালতই বাস্তবে অসহায় ও অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

প্রশাসনকে কৌশলে আদালতের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার এ ব্যবস্থাটি করা হচ্ছে বিচার বিভাগের ওপর থেকে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার প্রেক্ষাপটে। অতিগোপনে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নতুন আদালত অবমাননা আইনের খসড়াটি আগলে রেখেছেন প্রশাসন ও আইন মন্ত্রণালয়ের হাতেগোনা কয়েকজন প্রবীণ

সাংবাদিক, লেখক, সংস্কৃতিকর্মীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীরা। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আদালত অবমাননা প্রশ্নে হয়রানির ভীতিতে থাকেন বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনটিকে এজন্যই যুগোপযোগী করার দাবি বেশ কিছুকাল থেকে। বিশেষ করে আইনটিতে আদালত অবমাননার কোনো সংজ্ঞা না থাকায় আদালত নিজেই যখন যেমনটি ভেবেছেন সেভাবেই এ আইনকে ব্যবহার করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত থেকে আইনটির কিছু ব্যাখ্যাও হয়েছে। পাকিস্তান ও ভারতেও একই আইন প্রচলিত ছিল। তারা তাদের সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের দেওয়া বিভিন্ন সময়ের ব্যাখ্যাকে সমন্বিত করে নতুন আদালত অবমাননা আইন তৈরি করে নিয়েছে। বিগত সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশেও একই ধরনের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। জাতীয় সংসদের শেষ বাজেট অধিবেশনে এ লক্ষ্যে একটি বিল উত্থাপন করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা আর পাস করা হয়নি।

বিলটি পাস না হওয়ার নেপথ্যে ভূমিকা ছিল সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তার। বিচার বিভাগ পৃথক করার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে তখন তারা সরকারি কর্মকর্তাদের আদালতের নাগালের বাইরে নিয়ে আসার জন্য বিলটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে কাছাকাছি সময়ে বিভিন্ন রায় ও নির্দেশ বাস্তবায়ন না করায় কয়েকজন সচিব সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ পাওয়ায় এবং বিচার বিভাগ পৃথক করা সম্পর্কিত মাসদার হোসেন মামলার রায় বাস্তবায়নে আদালতের সঙ্গে অসহযোগিতা ও বিভ্রান্তিকর প্রয়াস গ্রহণের দায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে দীর্ঘদিন যাবৎ আদালতে হাজির হতে হচ্ছে লক্ষ্য করে তারা এ থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজেন। এ পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর আদালতের ক্ষমতা খর্ব করার পরিকল্কপ্পনা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে ওঠেন তারা। কিন্তু রাজনৈতিক সরকার তেমন ব্যবস্থা করতে সফল হয়নি। এর ভবিষ্যৎ সামাজিক পরিণতি সম্পর্ক সরকার সতর্ক থাকায় তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ পর্যায়ে সংসদে উত্থাপিত বিলটির কিছু ত্রুটিকে সামনে রেখে নতুন আইনটি প্রণয়ন বিলম্বিত করতে সচেষ্ট হন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিছু আমলা কর্মকর্তা। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী আইনটি প্রণয়নের জন্য তারা আবারো তৎপরতা শুরু করলেন

১ম পৃষ্ঠার পর

একজনকে হত্যা একজনকে নির্বাসন

পারেন বলে মন্তব্য করেন। এটা সত্যিই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের স্বাধীনতার রূপকার এবং জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা যিনি নিজেও বাংলাদেশে এককালিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই সাথে আরেক স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধের অমর নায়ক সাবেক সেনাপ্রধান ও সাবেক রাষ্ট্রপতির স্ত্রী যিনি নিজেও দুইবার দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাকে আজ সামরিক সরকার করাবন্দি করে রেখে একটি জঘন্যতম অপরাধ করছে। তাদের চিকিৎসা না দিয়ে আস্তে আস্তে পাশ্চাত্য ও আরবদের পরিকল্পনায় বিশ্বের সর্বাধুনিক পন্থায় মেডিকেলি পয়জন করে মৃত্যর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও তাদের অপকর্ম ছিল ক্ষমার অযোগ্য। তারপরও দুজন নারীকে এভাবে কাররুদ্ধ রাখা একটি কলঙ্ক। ভুলে গেলে চলবে না যে, তারাও দেশের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করে গেছেন।

যে অপরাধে শেখ হাসিনাকে আটক রাখা হয়েছে তা আজ সকলের কাছেই পরিস্কার যে, বাংলাদেশ থেকে গণতন্ত্রের শাসন দীর্ঘ দিনের জন্য বিদায় জানিয়ে আধুনিক পন্থায় গনতন্ত্রের মুখোশ পরে পুজিবাদীদের সমর্থনে সামরিক শাসনকর্তাদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করে কতিপয় সুবিদাবাদী রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে আমাদের সৈনিকদের সুচারু ভাবে কাজে লাগিয়ে দেশকে আস্তে আস্তে পাকিস্তান অথবা মিয়ানমার (বার্মার) এর মতো একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিনত করে অগনিত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অর্থ সম্পত্তিতে এবং দুর্নীতিতে জড়িত করে এবং স্বাধীনতার শত্রুদের বাংলাদেশে আরো শক্তিশালী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ওরা পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে নৌকা সাজিঁয়ে নিজ দেশে পৌঁছে দিয়েও কিন্তু খুন করতে কার্পন্যবোধ করেনি। বর্তমান বিশ্বায়ন পরিকল্পনায় বাংলাদেশের রাজনীতি কিছুকালের জন্য সামরিক কর্তাদের মাধ্যমে পরিচালনা করে বাংলাদেশের সকল সম্পদ লুট করে নেয়ার পরিকল্পনা করেছে তারা। আর সেই জন্য যদি একজনকে উন্নত প্রক্রিয়ায় হত্যাও করতে হয় তাও তারা করবে আর অপরজনকে তার পছন্দ মতো একটা রাষ্ট্রে পরিবার সহ পাঠিয়ে দিয়ে বাংলার জনগণকে শোষনের জন্য তৈরী হচ্ছে। সোচ্চার থাকুন । সব কিছুর প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখুন।

Legal Notice:- Copyright 1998-2006. The Bi-Weekly Journal Dhaka Post. All right reserved. republication or distridution of any metrial (design, logo, photographs, news. articles, etc) from Journal Dhaka Post or www.dhakapost.cpm is strictly prhibited without the prior written permission of Journal Dhaka Post.

Journal Dhaka Post defends and stand for imprisoned journalists and press freedom throughout the world. as well as the right to inform the public and to be informed in accordance with article 19 of the universal declaration of human rights.

Bibliotheque Nationale du Quebec depot legal no- 2998758

জেনারেল শাষিত দেশ

১ম পৃষ্ঠার পর

দিবেই। সেই দিক থেকে বর্তমান জেনারেলগণেরাও এর বাহিরে নন। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে একজন করে জেনারেল নিয়মিত অথবা অবঃ প্রাপ্ত কাউকে বসিয়ে দেশের পুরো অর্থ তাদের নিয়ন্ত্রনে রেখেছেন। একদিকে উন্নয়নের নামে সর্বকালের সর্ব্ববৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়ে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই সেইগুলো বাস্তবায়নের নামে নিজেদের পরিকল্পিত লোকজনদের বসিয়ে অবিরাম অডিট খরচা খাতা পুরন করে যাচ্ছেন।

কাজের কাজ কি হচ্ছে বা তার দেখভাল কে কি করছে তার জবাব দেয়ার মতো কেউ নেই। শুধু বুল ডোজার দিয়ে মাঝে মাঝে দু-চারটি বাড়ি ঘর ভেঙ্গে আযান দিয়ে জনগণকে জানিয়ে দেন আমরা দুর্নীতির শাসনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছি।

অবশ্য এমন একটা পরিকল্পনা আর শাসন ব্যবস্থা যে আসছে তার পুর্বাভাস ঢাকা পোস্ট বহু আগে থেকেই জনগণকে জানিয়ে আসছিল। অবশেষে সেই পর্বেরই সন্মুক্ষীন আজ আমরা সকলে।

জেনারেল সাহেব মার্কিননীদের খুশি করতে হঠাৎ করেই মার্কিন দেশ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা দিয়ে বোয়িং বিমান খরিদের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করার কাজে ব্যাস্ত হয়ে পরেছেন। অপর দিকে সিভিল সরকার বলছে দেশে গ্যাস নেই কিছুকালের মধ্যে বাংলাদেশ গ্যাসহীন হয়ে পরবে। বাংলাদেশে গ্যাস আমদানী করতে হবে পাশের দেশ মিয়ানমার থেকে। সত্যিই দুঃখজনক ।

এই গ্যাস নিয়ে বিগত সব সরকারই জনগেণের সাথে প্রতারণা করেছে। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃত ভাবে জানতে পারেনি তাদের দেশে কি পরিমান গ্যাস আছে আর সেই গ্যাস দিয়ে সত্যিকার অর্থেই কতদিন চলবে। একটা বড় আকারের দেশদ্রোহী দলের হাতে এই জ্বালানী বিষয়টির নিয়ন্ত্রন থাকে। আর এর সবকিছুর মুলেই রয়েছে বিশ্ব ব্যাংক এডিবি। তাদের কথা হলো মুল্য বাড়াও মুল্য বাড়াও।

যে বাংলাদেশে নিজ দেশের জনগণকেই এই পর্যন্ত গ্যাসের স্বাদ দিতে পারেনি সেই দেশ বিদেশীদের কাছে গ্যাস বিক্রি করে নিজেদের আর্থিক ভাবে লাভবান করে দেশের সম্পদ লুট করে তারা কখনই প্রকৃত বাংলাদেশী হতে পারে না।

বর্তমান বিশ্বে জ্বালানী ক্ষুধার্ত মার্কিন দেশ নিজ দেশে জ্বালানী সংকট থেকে মুক্তির উপায় বের করতে মরিয়া ।মার্কিনীরা যে কোন দেশের সরকারকে হত্যা করতে কুন্ঠাবোধ করবে না।

কিছুদিন আগে উপদেষ্টাা তপন চৌধুরীও হাজার হাজার কোটি টাকার বিদ্যুৎ প্রকল্প করে লুটপাট করে নিজেই সরে গেলেন। আর এখন সরকার বলছে দেশের সামনে অন্ধকার ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকবে। এই রকম আরো যে কতো পাগলা প্রজেক্ট জেনারেল সাহেবেরা পাশ করিয়ে নিচ্ছেন তার কোন হিসেবই নেই।

জেনারেল সাহেবদের অতিরিক্ত লুটপাটের কারণেই আগামী নির্বাচন হচ্ছে না। কারণ, জেনারেলগণেরা এতো লুটপাট সহজেই হজম করতে পারবেনা। তাই তারা আরো সময় নিতে চাইছেন। তাদের এই আবদারটিকে আন্তর্জাতিক সমর্থন পেতে প্রধান জেনারেল ইতিমধ্যেই ভারত এবং কয়েকদিনের মধ্যেই মার্কিন রাষ্ট্র সফরে আসছেন। তার এই সফরের মুল লক্ষ্যই থাকবে বুশ প্রশাসন সহ ডেমোক্রেটিক শিবিরের সিনেটরদের বুঝানো যে, বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র তৈরী করতে তার সামরিক সরকার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এই অল্প সময় এর জন্য যথেষ্ট নয়। তার আরো সময় চাই। অন্তত আরো ৩ বছর। ঠিক একই ভাবে পুতুল সরকারের প্রধান ফখরুদ্দিন আহমেদ বৃটেন সফর করে সেই দেশের সরকারকে বুঝাতে চাইছেন। ইতিমধ্যেই জেনারেলদের জরুরী বিচার আরো দুই বছর বাড়িয়ে নিয়েছেন। নির্বাচন অফিসে যেই জেনারেল আছেন তিনিতো বলেই দিয়েছেন নির্বাচন জরুরী অবস্থার ভিতরেই হবে।

আর যদিও হয় সেটা হবে শুধু লোক এবং বিশ্বকে দেখানো একটা যেন তেন নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বেশির ভাগই অংশগ্রহন করবে দেশে বর্তমান এবং সাবেক জেনারেলগণেরা এবং জামায়েত। হয়তো জামায়েত সেই নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলের ভুমিকা পালন করবে।

মোট কথা বর্তমান শাসনকর্তাদের মধ্যে তিনটি ভাগ। একটি ভাগ মার্কিনীদের পক্ষে। আরেকটি ভাগ সৌদী কট্টরপন্থি তথা জামায়েত দলের পক্ষে এবং অন্য একটি দল ইউরোপিয়ান গ্রুপের পক্ষে তথা গনতন্ত্রের পক্ষে। তবে এই গ্রুপটির অবস্থান খুবই নাজুক।

যারা গণতন্ত্রর ভক্ত তারা তো সামরিক শাসক বা তাদের শাসন সমর্থন করতে পারে না। গণতন্ত্রের ভক্তদের মধ্যে সিভিল সোসাইটির লোকজন সাধারণত সেচ্চার ও সক্রিয় থাকেন। এই সিভিল সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের মধ্যে আছেন সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত মানুষজন, আইনজীবী এবং শিক্ষক সম্প্রদায়। এদের মধ্যে এখন সরাসরি পক্ষালম্বন দেখা যায়। আমাদের সাংবাদিক, টিভি মালিক এবং আইনজীবিদের মধ্যে এমন কিছু মানুষজন ঘরোয়া আলোচনা-সমালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হয়ে ওঠেন। এদের চিনতে কষ্ট হয় না। তবে এরা সংখ্যায় সীমিত বলে এদের ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরা হয়, নিয়ম হিসেবে নয়। পাকিস্তানেও এমন চরিত্রের লোক ছিল। কিন্তু' গত নির্বাচনে তারা তলিয়ে গেছে। সিভিল সোসাইটি তো বাস্তবে জঙ্গলের শাসন নামে সেনাশাসনকে সমর্থন করতে পারে না, করেও না। বিশ্বনন্দিত 'ডেমোক্রেসি'তেই যদি বিশ্বাস রাখতে হয়, তাহলে তো নির্বাচন ব্যবস্থাকেও মানতে হবে। সেনাশাসন তো কোন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আসে না। তারা তো বন্দুকের জোরেই ক্ষমতা দখল করে। তাদের কাছে বন্দুক, ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি থাকে; তাদের কাছে মানুষ মারার যন্ত্র পাতি, সাজ-সরঞ্জাম থাকে; সেই ভয় দেখিয়েই তো তারা প্রেসিডেন্ট 'চিফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে যান। আমাদের জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন সিভিল সোসাইটির সমর্থন পেলেন না, তিনি ভর করলেন গোলাম আযমদের মতো লোকদের। মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের তিনি ইজ্জত, মর্যাদা, পদ-পদবি এবং স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়ে তার অবৈধ শাসনকে বৈধ করতে চাইলেন। তিনি দলও একটি খাড়া করেছিলেন এবং সেই দল এখন বিশ-পঁচিশ বছর পরও প্রায় একই চরিত্রের রয়ে গেছে। সাহায্য-সমর্থনের দরকার হলে এখনও একাত্তর বিরোধীরাই এ দলের প্রধান ভরসা।

দেশে আজ বহু জেনারেল শাসিত একটি দেশ অন্য অর্থে একটি সামরিক সরকারে পরিণত হয়েছে। ছবিতে ২০০৫ সালে বর্তমান দুদক চেয়ারম্যান জেনারেল মশহুদের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহন করছেন বর্তমান সামরিক শাষন কর্তাদের প্রধান জেনারেল মঈন ।

জেনারেল জিয়াউর রহমান আরও এক জায়গায় প্রবল সাহায্য-সমর্থন পেলেন– একাত্তরের ঘাতক বলে অভিযুক্ত মাওলানা আবদুল মান্নানের মাদ্রাসা শিকদের সংগঠন 'জমিয়াতুল মুদার্রেসীন'। মাওলানা মান্নানের এই সংগঠনের ওপর ভর করলেন বাংলাদেশের দ্বিতীয় মিলিটারি শাসক জেনারেল এরশাদও। মাওলানা মান্নান তার এই সংগঠনকে ভাড়া দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমানের পর জেনারেল এরশাদকেও। জিয়াউর রহমান বানিয়েছিলেন মাওলানা মান্নানকে ১৯৭৯-এর নির্বাচনে জাতীয় সংসদের একজন এমপি, বিচারপতি সাত্তার প্রেসিডেন্ট হয়ে তাকে বানালেন একজন উপমন্ত্রী; আর জেনারেল এরশাদ পুরো মন্ত্রী! সর্ষিনার পীরকে জিয়াউর রহমান দিলেন স্বাধীনতা পুরস্কার। আর জেনারেল এরশাদ বানালেন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম। হুসেইন হাক্কানির বর্ণনা মতে, এরশাদ তার মিলিটারির সঙ্গে 'মস্ক' এর 'এলায়েন্স' ঘটালেন। আরও অনেকভাবে তার নয় বছরের অপশাসনকালে। আমাদের 'গণতন্ত্রী' প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রী বানিয়ে এবং রাজশাহী অঞ্চলের কতগুলো জায়গা জঙ্গিদের ইজারা দিয়ে পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হককেই পীরের মর্যাদা দিলেন এই বাংলাদেশে!

বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ আটরশির পীরের মুরিদ। কিন্তুএই লাখ লাখ মানুষ কি আটরশির ছেলের রাজনৈতিক দল জাকের পার্টিকে ভোট দেয়?

কখন জামাতিদের, একাত্তরের ঘাতক-রাজাকার-আলবদর এবং তাদের 'মুরুব্বি'দেরও আছাড় দিতে পারব? আমি সেই দিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

আমরা দেখতে দেখতেই তলিয়ে যাব ঘন অন্ধকারে।

ওবামই প্রেসিডন্ট

১ম পৃষ্ঠার পর

অবশ্য হিলারী _ নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে না ভেবে কমান্ডার ইন চীফ বলতেই বেশি ভালবাসেন। তার প্রধান কারন হচ্ছে যুদ্ধে লিপ্ত মার্কিনীদের নাকি এখন একজন যোগ্য সামরিক বাহিনীর জন্য সর্বাধিনায়ক প্রয়োজন যিনি যুদ্ধ পরিচালনায় বিচক্ষনতার পরিচয় দিবেন। অপর দিকে অর্ধেক সাদা অর্ধেক কালো তুখোর নওজোয়ান বিজ্ঞ বাজনীতবীদ প্রথম কালো সিনেটর হার্ভাড ডিগ্রিপ্রাপ্ত নতুন স্বপ্নের অধিনায়ক নিজেকে মার্কিন মুল্লুকের পরবর্তি প্রেসিডেন্ট হিসেবেই পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি- প্রতিষ্ঠিত করবেন। যুদ্ধ ব্যায় বন্ধ করে শিক্ষার ব্যয় বাড়াবেন। বিশ্বে মার্কিনীদের মর্যাদা পনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। এখন পর্যন্ত নির্বাচনী দৌড়ে ওবামাই অনেকাংশে এগিয়ে আছেন। মার্কিন তরুনদের ব্যাপক সমর্থনও তিনি পাচ্ছেন। বর্ণহীন ভাবে তিনি সকল জাতিরই সমর্থন পেয়ে আসছেন। এমন কি মার্কিন মুল্লুকের কড়া সব প্রবীণ এবং দক্ষ রাজনীতিবীদদের সমর্থন সহ সাবেক সব জেনারেলদের ও সমর্থন পাচ্ছেন। অবশ্য মিডিয়া প্রপোগান্ডা বেশ চরমে। মিডিয়া রাজ্যে বিভক্তিও বেশ লক্ষনীয়। মিডিয়া কর্তৃক ধীরে ধীরে বিষয়টিকে বর্ণবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই শ্বেতাঙ্গরাও কোনদিন ভাবতে পারেনি এতোদ্রুত তাদের এই ধরনের একটি জটিল পরিস্থিতিতে পরতে হবে। হোয়াইট হাউজের দ্বারপ্রান্তে একজন কৃষ্ণাঙ্গ এতা দ্রুত পৌঁছে যাবে। সত্যিকথা বলতে কি শ্বেতাঙ্গদেরও মাঝে কোন ব্যাক্তি বা রাজনীতিবিদ নেই যিনি এই যুদ্ধকালীন ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য থেকে জাতিকে আশার কোন বানী শোনাতে পারবে। অপর দিকে তেমন কোন যোগ্য রাজনীতিবিদও নেই। কারন, সকল রাজনীতিবিদদেরও কিছু না কিছু অপরাধ অথবা দনীতি আছে যার জন্য তারাও আজ সাহস করে মার্কিন পেসিডেন্ট হওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে পারে না। সেই দিক থেকে ওবামা অবশ্যই ভাগ্যবান। কেনেডী পরিবার তাকে নতুন কেনেডি হিসাবে আখ্যা দিয়ে সমগ্র জাতির কাছে তার গ্রহণযোগতা প্রতিষ্ঠায় বেশ সাহায্য করেছে। আজ থেকে চার বছর আগে জন কেরীর নির্বাচনী সভায় প্রথমবারের মতো ওবামা জাতিয় মিডিয়া মাধ্যমে যখন একটি আলোড়নকারী বক্তব্য প্রদান করেন ঠিক তখনই বড় বড় মিডিয়া তাকে ভবিষ্যত মার্কিন পেসিডেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার বক্তব্যেও সাহসিকতা ছিল উল্লেখ করার মতো। সেদিনও সেই বক্তব্যে ছিল বুশের যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। তিনিউ একমাত্র সিনেটর যিনি সবসময়ই যুদ্ধের বিরুদ্ধ ভোট দিয়ে গেছেন এবং এখনো তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সমগ্র কানাডায় এক জরিপে দেখা গেছে ওবামার জন্যপিয়তা অনেক তুঙ্গে। শুধু মাত্র ওটোয়া হারপার সরকার ছাড়া। তারা যুদ্ধ ভালবাসেন না এমন কাউক মেনে নিতে পারছেন না। বুশের বি টিম বলে খ্যাত হারপার গত ওহাইও প্রাইমারীতে নাফটা সম্পর্কিত কিছু ভুল তথ্য মিডিয়ায় ফাঁস করে দিয়েও ওবামাকে ওহাইওতে পরাজয়ের জন্য কাজ করেছেন। তারপরও থেমে যাননি ওবামা, এখনো প্রতিনিধি ভোটে এগিয়ে আছেন তিনি তার সাথে জনমত এবং পপুলার ভোটেও হিলারী থেকে এগিয়ে আছেন তিনি। মিসিসিপিতে হিলারীকে পরাজিত করে পেনসিলভেনিয়া প্রাইমারিকে সামনে রেখে হিলারি কিনটন ও বারাক ওবামার মধ্যকার লড়াই আবার জমে উঠেছে। ইলিনয়ের সিনেটর ওবামার কাছে বহু অঙ্গরাজ্যের দলীয় নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষে হোয়াইট হাউসের প্রার্থিতা নিশ্চিত করার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েছেন সাবেক ফার্স্টলেডি ও নিউইয়র্কের সিনেটর হিলারি। এমন অবস্থায় পেনসেলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারিতে যে করেই হোক হিলারিকে জিততে হবে। নয়তো এই মনোনয়ন দৌড় থেকে তাকে ছিটকে পড়তে হবে।

প্রাইমারিগুলো এখন হিলারি ক্লিনটন এমনকি তার স্বামী বিল ক্লিনটনের জন্য বাঁচা-মরার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। মরিয়া হিলারি-বিল তাই বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ওবামা বিরোধী নতুন বিজ্ঞাপন ছেড়েছেন। পিছিয়ে নেই বারাক ওবামাও। হিলারির বির"দ্ধে পাল্টা বিজ্ঞাপন ছেড়েছেন তিনি। জমে উঠেছে দুজনের শেষ মুহুর্তের এই লড়াইগুলো।

আমেরিকান সহ বিশ্বেও অনেক দেশ ও জনগণের কাছে তাই এখন প্রতিটি মুহর্তই নাটকীয়। রুদ্ধশ্বাসে সবাই প্রতীক্ষা করছে ফলাফলের। ডেমোক্রেট পার্টির হয়ে কে চূড়ান্ত নির্বাচনে যাবেন সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে একটি বিষয়ে প্রতি মুহুর্তেই শংকা জাগে যে, পরুষ শাষিত মার্কিনীরা কি এতো সহজেই একজন নারীর হাতে তাদের ক্ষমতা তুলে দিবে? অপরদিকে মার্কিন ইতিহাসের লগ্ন থেকে শ্বেতাঙ্গ শাষিত কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতিত একটি দেশে শ্বেতাঙ্গ সমাজই কি প্রস্তুত আছে একজন কালো চামড়ার কাউকে দেশের সর্বাধিনায়ক হিসেবে মেনে নিতে? মনে অনেক শংকা শেষ পর্যন্ত- না আরো একটি কেনেডির মতো হত্যাকান্ড ঘটে না যায়। কথায় বলে..মার্কিনীরা সব পারে। নিজেদের স্বার্থে। তবে একটা বিষয়ে আমরা সকলে সন্দিহান.. যে ওবামা নির্বাচিত হলে কি " হোয়াইট হাউস" খ্যাত নাম কি " ব্ল্যাক হাউস" নামে ডাকা হবে।

দক্ষিন এশিয়া পরিবারতন্ত্র

১ম পৃষ্ঠার পর

হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মার্কিনীরা। নারী নেতৃত্ব এবং পাকিস্তান-বাংলাদেশের ছোট কাঁচা গণতন্ত্রের জন্য তাদের বিনিয়োগ এবং জ্বালানি চাহিদা লুটপাটে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে না। তাইতো তারা আজ তার মাঠে নেমেছে দক্ষিন এশিয়া গণতন্ত্র শুন্য করে সকল নারী নেতৃত্বদের হত্যা অথবা নির্বাসন দিয়ে তাদের চাটুকারী পাতানো সরকার দিয়ে দেশের সম্পদ লুট করতে।

ইহুদিদদের সাথে ভারতের সক্ষতা প্রমান করে ভারত দক্ষিন এশিয়ায় একটি বিপদজনক রাষ্ট্রে পরিনত হচ্ছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। ভারতের নেহেরু-গান্ধী পরিবার, শ্রীলংকায় বন্দরনায়েকে পরিবার, পাকিস্তানে ভুট্টো পরিবার, আইয়ুব পরিবার, বাংলাদেশে শেখ মুজিব পরিবার, জিয়া পরিবার, মিয়ানমারে অং সান পরিবার, ইন্দোনেশিয়ায় সুকন পরিবার, ফিলিপাইনের একুইনো পরিবার এর অন্যতম উদাহরণ।

নেহরু গান্ধী পরিবার পাঁচ প্রজন্ম ধরে ভারতের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে আছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই পরিবারের জওহরলাল নেহরু প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। তার জীবদ্দশাতেই কন্যা ইন্দিরা গান্ধী রাজনীতিতে আসেন এবং পরবর্তীকালে দুই দফা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নিজের শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর তার পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। তিনিও একসময় আত্মঘাতি বোমায় নিহত হন। রাজীব গান্ধীর ইটালীয় বংশোদ্ভুত পত্নী সোনিয়া গান্ধী বর্তমানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের সভাপতি। মার্কিনীদের সাথে মনোমালিন্য। তার পুত্র রাহুল গান্ধী এবং কন্যা প্রিয়াংকা রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন।

শ্রীলংকার রাজনীতিতে বন্দরনায়েকে পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েকে গুলিতে নিহত হওয়ার পর তার পত্নী একাধিকবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। কন্যা কুমারাতুঙ্গাও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। মার্কিনীদের পরিকল্পনায় সামরিক শাসক জিয়াউল হক তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর পর এক সময় মার্কিনীরা তাকেও প্লেন উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করেন। তারপর ভুট্টো কন্যা বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তাকেও শেষ পর্যন্ত তারা হত্যা করে দক্ষিন এশিয়ায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হলো। তাদের হত্যা নকশায় (হিট লিষ্টে) বাংলাদেশের সাবকে দুই প্রধানমন্ত্রীর একজন আছেন বলে ধারনা করা হচ্ছে।

মিয়ানমারের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী অং সান গুলিতে নিহত হন। পরে তার কন্যা অংসান সুচি পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেও সামরিক শাসকরা তার হাতে ক্ষমতা না দিয়ে তাকে অন্তরীণ করে রাখে।

এশিয়ার রাজনীতিতে পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। তবে এশিয়ার বাইরেও রাজনীতিতে পরিবারের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে কেনেডি পরিবারের প্রতি সেদেশের জনগণের বিপুল আস্থা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের পত্নী হিলারি ক্লিনটন সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন এবং আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ধারনা করা হচ্ছে। আর বুশ পরিবার তো সেদেশের ক্ষমতায়ই রয়েছেন।